"খোয়াড়"

খন্দকার মোঃ আবদুল গণি

দিনের কর্ম শেষে ওরা চারজন একত্রিত হয় সুইপার কলোনীর ছোট্ট টিনশেড ঘরে। মরা মিয়া, অখিল, মাইকেল এবং অনিক। কে কোন জাতের বা কোন ধর্মের তা ওদের কাছে বড় কথা নয়। আত্মিক মিলই ওদের ধর্ম। আনুষ্টানিক ভাবে কোন ধম-কর্ম পালন করেনা। কাজ শেষে যা পায় তা ভাগ-বাটোয়ারা করে রাতে একসাথে বসে মদ খায়। জনশ্রুতি আছে ওরা যে কাজ করে সে কাজ করতে গেলে নাকি মদ খেতে হয়। সস্তা দামের বাংলা মদ। মদ খেয়ে নেশায় যখন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তখন ফুরফুরে মেজাজে গল্প জুড়ে দেয়। কেউ বা খস্‌খসে গলায় গান শুরু করে। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সমস্ত কল্পনা একে একে চোখের সামনে ভেসে উঠে আর তাতে অবগাহন করে হায়াতের রশি দিনে দিনে কেটে দিচ্ছে।

পেশায় ওরা সুইপার। নর্দমা পরিষ্কার এবং টয়লেট সাফ করে রুটি রোজগার করে বেশ স্বাচ্ছন্দেই দিনাতিপাত করে। দেশের উন্নয়নে কোন যায় আসে না আবার অব-উন্নয়নে কোন মাথা ব্যাথা নেই। দেশ রসাতলে গেলে যাক্। দিনে দিনে যতই জনসংখ্যা বাড়ুক তাতে ওদের কর্মে কোন ব্যাঘাত ঘটবেনা। যত বেশি মুখ হবে ততবেশি পেট হবে। আর পেট হলে নর্দমার চাহিদা ও বাড়বে। ওদের কাজও বাড়বে তাই মিছে মিছে ভেবে কি লাভ? তবুও মাঝে মাঝে খবরের কাগজ নিয়ে বসে। আশ্চর্যজনক কোন ঘটনা দেখলে মনে খায়েশ জন্মে প্রেম-ভালোবাসার। এ দলের প্রধান সর্দার মরা মিয়া। মুলতঃ মরা মিয়াই ব-কলমের হাত থেকে অনেকটা নিজেকে বাঁচিয়েছে। আর সবগুলোই ব-কলম। এ জন্য বাকি তিনজন মরা মিয়াকে বেশ সমীহ করে চলে। একদিন মদ খাওয়ার সময় হঠাৎ করেই মরা মিয়া সকলকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল–

– ভাবছি, এই হানে আর থাকুম না। গেরামে চইল্যা যামু। অত্যাধিক আশ্চর্যজনক ভাবে অখিল বলে বসল–

– গেরামে যাইবা? সেইখানে খাইবা কি, মরা ভাই? গেরামে তো কেউ ডাষ্টবিন-পায়খানা সাফ কইর‍্যা লইব না। ট্যাকা না থাকলে প্যাট চালাইবা ক্যামনে?

– মাইনসের খ্যাতে কাম করমু। যা পামু দুইজন মাইনসের চইল্যা যাইব।

– কি কও, মরা ভাই! হুনছি তোমার মা-বাপ কেউ নাই। তুমি দুইজন পাইলা কনে?

– গেরামে যাইয়্যা হাসিনারে বিয়া কইর‍্যা ফ্যালামু। তারপর দুইজনে একলগে ঘর-সংসার করমু। হাসিনা আমারে বহুত পেয়ার করে। তুমি যদি দেখতা অখিল ভাই ভাই, থয় আমাদের কইতা সংসার কইর‍্যা খাও। এবারে যখন হাসিনারে বিয়ার কথা কইলাম হ্যায় কইলো টাকা-পয়সা গুছাও, আমি তুমারে ছাড়া কাউরে বিয়া করুম না।

অখিল ও মরা মিয়া যখন কথা বলছে মাইকেল তখন গান জুড়ে দিয়েছে। একে তো গলা কর্কস তার ওপর মদের নেশা দুয়ে মিলে গান না হয়ে, হয়ে উঠেছে খালাসীদের সুর তোলার মত। মরা মিয়ার বিয়ে করার কথা শুনে নেশাময় চোখ ছানাবড়া করে ক্ষণকাল চাইল। তারপর বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করে অখিলকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল–

– বাউরে,আঁর হাত চুলকার। আর থন্ মনে অয় হাতে বটগাছ উঠবো।

– কি যে কও না মাইকেল ভাই। হাতে কারও বটগাছ উডে নাকে?

– উঠবো। আঁই কইছি তুঁই দেইখ্যো। যিদিন মরা ভাই বিয়া করব হেইদিন উঠবো।

– এইসব বাজে কথা তুমি যে কই পাও তা বুঝবার পারিনা। মরা ভাইয়ের বিয়ার লগে হাতে বটগাছ উঠনের সম্পর্ক কি?

– উমা, আঁই কইয়ের। আঁর হাতে বটগাছ উঠত ন আর মরা ভাই বিয়া করতে হ্যারতো ন। এই বিয়া করলে উঠবো আঁই কইলাম। তুঁই চাইয়্যো।

– পারব ল্যা কেন?

– হ্যারতো ন্ ইয়ার লাই যে মরা ভাই ইয়ার আগে দুই-দুইবার বিয়্যা কইত্যো চাইছিল। তুঁই কও হারছে নি বিয়া কইত্যে?

সভার মধ্যমনি যখন আসন ত্যাগ করে তখন সভা আর জমেনা। মাইকেলের কথা শুনে লজ্জিত বিরক্ত ভাব নিয়ে মরা মিয়া ঘর থেকে বের হয়ে গেল। মরা মিয়া ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পর নেশাক্রান্ত মন নিয়ে সকলে ঘুমিয়ে পড়ল। ক্ষণকাল বাইরে ঘুরে এসে তারপর ঘরে প্রবেশ করে মরা মিয়াও ঘুমিয়ে পড়ল।

তারপর থেকে দিন যত গড়তে লাগল মরা মিয়ার মনে তত আমুল পরিবর্তন হতে লাগল। ডাষ্টবিন পরিষ্কার করার সময় পাশ দিয়ে কোন নারী হেঁটে যেতে লাগলে অ-পলক চোখে চেয়ে থাকত। হাসিনার মুখচ্ছবি মনের আয়নায় মুক্তোর মত জ্বল জ্বল করে উঠতে লাগল। একি হল তাঁর। মনটা সদাই ছুটে যেতে চায় হাসিনার কাছে। ক্লান্ত জীবনে মায়াবী হাতের স্পর্শ পেতে চায়। মনটা অস্থির এবং অশান্ত হয়ে উঠে। এমনি সময়ে হঠাৎ করেই একদিন খবর এল হাসিনার বিয়ে হয়ে গেছে। এ খবর সহ্য হবার মত নয়। তবুও তো এটাই বাস্তবতা। বাস্ত বতাকে তো মেনে নিতেই হবে। কিন্তু অবাধ্য মন কোন কথা শুনে না। নিজেকে যতই দুঃচিন্ত ার হাত হতে মুক্ত করতে চায় ততই পুরনো স্মৃতি এসে মনের মাঝে ভিড় করে। সঙ্খী তিনজনের সাথেও তেমন কোন ভাব বিনিময় হয় না। কেন জানি সবকিছু পর এবং খাপছাড়া লাগে। মদের মাত্রা দ্বি-গুন বেড়ে গেল। দিনে কাজ করে যা পায় তার সিংহ ভাগই মদের পেছনে ব্যায় হয়। হোক্ তাতে ক্ষতি কি? ইহজগতে তার আপন কেউ নেই। কার জন্য সম্পদের পাহাড় গড়বে? যার জন্য গড়ার পরিকল্পনা করেছিল সেও এখন নেই। অন্যের ঘরণী হয়ে দিনাতিপাত করছে। এ ভালই হল বিরক্ত করার আর কেউ রইল না। মদ খেয়ে টাল হয়ে সরারাত পড়ে থাকে আবার সকালে উঠে কাজে যায়। এমনি করে দিন চলছিল। অখিল, মাইকের এবং অনিক কেউ জানেনা মরা মিয়ার জীবনের নির্মম পরাজয়ের কথা। কারও ঘর পুড়লে কোন প্রতিবেশী তা স্ব-চক্ষে না দেখলেও অন্তত গন্ধ পায়। ওরা তিনজন ও তেমনই কিছু আঁচ করতে পারল কিন্তু মুখ ফুটে কোন কিছু বলার সাহস কারও নেই। অখিলই যা একটু কথা জিজ্ঞেস করে। বাকি দু'জন একসাথে মদ খায় ব্যাস এ পর্যন্তই। মরা মিয়া নিজের থেকে কোন কথা বললে তবেই তারা জবাব দেয়। মরা মিয়ার এমন অভাবনীয় পরিবর্তন তারা সহ্য করতে পারল না। তাছাড়া তারাই তো সুখ-দুঃখের একমাত্র অংশীদার। কলহ-পুর্নমিলন ও একমাত্র তাদেরই। সভ্য সমাজের সভ্য মানুষের মল-মূত্র পরিষ্কার করে বলে তাদের চাইতে উচ্চ শ্রেণীর মানুষগুলো তাদেরকে মানুষই মনে করে না। রাস্তার অন্যান্য প্রাণীদের মতই তাদের জীবন। প্রয়োজনে ডাকে-অপ্রয়োজনে কেউ না। তাই তাদের সাথে কোন ভাব বিনিময় হয় না। তাদের শ্রেণীদের সাথেই তাদের ভাবের আদান-প্রদান। মরা মিয়ার এমন অবস্থা দেখে সমস্ত ভয়-ডর দূর করে হঠাৎ করেই একদিন অখিল মরা মিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল–

– মরা ভাই যে বাঁইচ্যা থাইক্যা ও মইর‍্যা গ্যাছ। আগের লাহান কথা কও না। খালি মদ খাইয়্যা সারাডা রাইত পইড়্যা থাকো। ব্যাপারডা কি বুঝবার পারি না।

– বাপজান মনে হয় বুঝবার পরিছিলো, আমি বাঁইচ্যা থাইক্যা ও মইর‍্যা যামু। তাই আমার নাম রাখছে মরা মিয়া।
– কি অলুক্ষনে কথা কও। মাইন্‌সে আবার বাঁইচ্যা থাইক্যা মইর‍্যা যায় নাকি!
– যায় গো ভাই,যায়। মাইনসেরে যখন সবকিছু চইল্যা যায় তখন বাঁইচ্যা থাকন আর মইর‍্যা যাওন ঐ এক।
– তা ঠিক। থয় তুমার আবার কি গেল। আমি তো দেহি সব ঠিকই আছে।
– কি যায় নাই, হেইডা কও। বাপ-মা দুইজনেই গ্যাছে। যে হাসিনা আছিলো হ্যার ও বিয়া হইয়্যা গ্যাছে। এহন কও আমার বাঁচন আর মরণ এক ন্যা।
– হাসিনার বিয়া হইয়্যা গ্যাছে! কই হেই কথা তো আমারে কও নাই।
– কই নাই ডরে। হেইদিন হুনো নাই , মাইকেল ভাই কইছিলো আমি বিয়া করলে হ্যার হাতে বটগাছ উঠবো। আসলে কথাডা ঠিক ঐ কইছে। আবার যদি তোমরা কোন কথা কও হেইডরে কই নাই।
– তুমি যে কইছিলা হাসিনা তোমারে বহুত পেয়ার করে, থয় বিয়া করলো না ক্যান?
– বিয়া করে নাই ক্যান জানো, আমার চাইতে খ্যাতে যারা কাম করে হ্যারা নাকি বহুত ভালা। আমারে বিয়া করলে হ্যার নাকি ইজ্জত যাইব, হেই কথা কইছে! যখন তোমার কাছ থাইক্যা ট্যাক-পয়সা, জামা-কাপড় লইত তখন ইজ্জত যাইত না? আসলে হ্যায় তোমারে পেয়ার করে নাই। তোমার লগে পিরিত-পিরিত খেলছে।

– হ ভাই। এতদিন বুঝবার পারি নাই ,এখন পারছি। আসলে ওরা সবই করবার পারে। বাঁচাইতে পারে আবার মারবারও পারে। থয় আমি মরুম না। বাঁইচ্যা থাকুম। হাসিনারে আমি ভুইল্যা যামু। এহন ঘুমাও-আমার নেশায় ধরছে।

দু'জনে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর দিনের কাজ শেষে ঘরে ফিরে প্রতিদিনের অভ্যাসমত রাত্রিকালে চার জন বসে গেল। আজ মরা বেশ উৎফুল্ল। হাতে পেপার নিয়ে পড়তে পড়তে বাকি তিনজনকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল–
–আমি তোমাগো আইজ খোয়াড়ের কথা শুনামু। মরা মিয়ার কথা শুনে অনিক বলে উঠল–
– খোয়াড় কি, মরা ভাই?
– খোয়াড় চেনো না? গরু-ছাগল মাইনসের খ্যাতের ধান খাইলে ধইর‍্যা নিয়া যেইখানে রাখে সেইডারে কয় খোয়াড়।
– ও বুঝছি! আবার দেশত ইয়ারে কয় খোয়াড়। তুঁই এই শহরত খোয়ার পাইলা কই?
– নাই বুঝি। তোমাগো চোখ নাই, তাই তোমরা দ্যাখবার পার না। আইচ্ছা কও দেহি গরু-ছাগল ধইর‍্যা নিয়া যেইখানে রাখে সেইডারে যদি খোয়াড় কয় থয় মহিনসেরে ধইর‍্যা নিয়া যেইখানে রাখে সেইডারে খোয়াড় কইব না ক্যান?
– ঠিকই তো কইছ! থয় এখানে তো ফাঁক থায়িবই। অনিলের কথা শেষ হওয়া মাত্র মাইকেল যে স্বভাবত কোন কথা বলে না সে হঠাৎ করে বলে উঠল–
– মরা ভাই ঠিকই কইছে। আসলে ইয়া খোয়াড় ঐ। নিরীহ গরু-ছাগল আটকাইয়া টেয়া লই আবার ছাড়ি দেয়। এইহানে যে খোয়াড় আছে আর খোয়াড় যারা দেখি রাখে, হ্যাতারা মাইনসেরে আটকাইয়া টেয়া লই ছাড়ি দেয়। অখিল বলে উঠল–
–মাইনসে খারাপ কাম করলে ধরব ন্যা ক্যা? মরা মিয়া বলে উঠল –

– ধরব ঠিক আছে। থয় বিচার না কইর‍্যা ট্যাকা খাইয়া ছাইড়্যা দিব ক্যা? ট্যাকা খাই খাই ছাড়ি দিলে হ্যারা আবার ও খারাপ কাম করব। যেমুন ধর কেউ চুরি করলো, হ্যারে ধইর‍্যা যদি হাত কাইট্যা দিত থয় আর কেউ চুরি করত না। আচ্ছা যাউক গা। যেইডা কইবার চাই হেইডা আগে হুনো। সকলে সমস্বরে বলে উঠল–

– হ-হ কউ ভাই।

মরা মিয়া বলতে আরম্ভ করল–

– আইজকা পেপারে লিখছে তিনজন স্কুলের পোলা স্কুল পলাইয়া ঘুরতাছিল। মাইসে যখন দেখছে তখন খোয়াড়ে খবর দিছে। হ্যারা গিয়া পোলা তিনডারে ধইর‍্যা খোয়াড়ে নিয়া গ্যাছে। পোলা গুলান বাঁচনের লাইগ্যা কি কইছে জানো? মাইকেল তৎক্ষণাৎ বলে উঠল– কি কইছে?

– কইছে যে স্কুলের এক কুড়ি পোলাপান পাচারকারী ধইর‍্যা নিয়া গ্যাছে। হ্যারাও ওইহানে আছিলো। চলন্ত গাড়ী থাইক্যা লাফ দিয়া পলাইছে। এইডা শুইন্যা খোয়াড় যারা পাহারা দেয় হ্যারা নাকি সারাডা রাইত ঘুমাইবার পারে নাই। সরারাত ধইর‍্যা পাচারকারীগো খুঁইজ্যা বেড়াইছে। যখন পায় নাই তখন পোলা তিনডারে আবার ধরছে। পোলা গুলান তখন কইছে বাঁচনের লাইগ্যা হ্যারা মিছা কথা কইছে। তারপর সকালে জনপ্রতি বার শ ট্যকা নিয়া পোলা গুলানরে ওগোর বাবা-মায়ের হাতে তুইল্যা দিছে। আইচ্ছা কও ওগোর মাথায় কি আইলো না যে চলন্ত গাড়ী থাইক্যা লাফ দিলে হাত-পা ভাঙব। না ভাঙলে ও কোন জাগায় চোট লাগব। আর নাই বা লাগলো যখন হ্যারা পলাইতে লাগছিল তখন পাচারকারীরা কি করতাছিল? হ্যারা কি এমনি এমনি ছাইড়্যা দিবে? খোয়াড়ে যারা আছে, হ্যারা পাগল না?

মরা মিয়ার কথা শেষ হওয়ামাত্র সকলে সমস্বরে হো হো করে হেসে উঠল। ইতিমধ্যে বাইরে গাড়ির শব্দ শোনা গেল। ঘর থেকে বের হয়ে মরা মিয়া দেখলো যে কয়েকজন খাকী পোষাক পরা খোয়াড়ের প্রহরি নেমে আসছে। তাদেরকে দেখে ঘরে ফিরে মরা মিয়া বলে উঠল–

– এই সারছে ভাই। আইজক্যা কার না কার কপাল পুড়বো। চারজন একত্রিত ভাবে বের হয়ে এল। কাকে নিয়ে যায় তা দেখার জন্য। খাকী পোশাক পরা ব্যাক্তিরা ওদের চারজনের সামনে এল। মরা মিয়ার দিকে তাকিয়ে বার কয়েক দেখে অন্য এক খাকী পোশাক পরিহিত ব্যাক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলল-

– পেয়েছি স্যার। ও দেখছি খুব শান্ত-শিষ্ট। ওকেই ধরে নিয়ে যাই।

– তা বলছ যখন নাও না। মরা মিয়াকে ধরে নিয়ে খোয়াড়ে বন্দি করে রাখল। মরা মিয়া কোন হেতুই বুঝতে পারল না। রসিকতা করে বলে উঠল-

– কি গো স্যার, আমি আবার কার খ্যাতের ধান খাইলাম যে আমাকে খোয়াড়ে বন্দি করলেন? একজন আরেক জনকে উদ্দেশ্য করে বলল –

– ব্যাটা তো ভারি রসিকতা জানে! বুঝবা কাল সকালে বুঝবা..। সরারাত খোয়াড়ে বন্দিকরে রাখার পর সকালে মরা মিয়াকে নিয়ে বিচার বসব। সাক্ষী এবং বাদী উভয়ই হল খোয়াড়ের রক্ষকগণ। বিচারের রায়ে মরা মিয়া অভিযুক্ত হর। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে সে নাকি খোয়াড়ের কন্ট্রোল রুমে ঝাড়ুদার কাজল মিয়ার নয় বছরের শিশুকন্যা তানিয়াকে ধর্ষণ করেছে। একথা শোনার পর মরা মিয়া চীৎকার করে কান্নাময় ভঙ্গিমায় বলে উঠল – বিশ্বাস করেন , আমি তানিয়ার ইজ্জত লই নাই। আমি হ্যারে আমার বইনের লাহান দেখি। নিজের বইনের কি কেউ ইজ্জত লয়..? মরা মিয়ার আকুতি কারও কানে প্রবেশ করল না। বিচারের লক্ষে আকুতি ভরা বাণী শুধুমাত্র দেয়ালে আঘাত হেনে প্রতিধ্বণী সৃষ্টি করে ক্ষণকাল শুধু অনুশোচনা সৃষ্টি হল কিন্তু বিশেষ কোন লাভ হল না। মরা মিয়ার চৌদ্দ বছর খোয়াড় বাস

হল। খোয়াড়ে ওরা তিনজন দেখতে গেল। খোয়াড় রক্ষকদের বেশ কিছু বখরা দিয়ে স্বাক্ষাৎ করার অনুমতি পেল। সেখানে তিনজন প্রবেশ করে বলে উঠল–

– মরা ভাই,আমাগো মাফ কইর‍্যা দিও। তোমার লাইগ্যা কিছুই করবার পারলাম না।

– দূর পাগল। তোমরা তো কোন অন্যায় কর নাই। এইডা ভালই হইল হাছিনার মনের খোয়াড়ে এতদিন বন্দি আছিলাম এখন এইডায়। থয় মজার কথা কি জানো কোনখানে আমি দোষ করি নাই। না হাসিনার মনের খোয়াড়ে না এইখানে, এখন যাও, বাঁইচ্যা থাকলে আবার দেখা হইব।

ওরা তিনজন চলে যাবার পর মরা মিয়া চুপচাপ খোয়াড়ের মধ্যে বসে রইল। বিকেল বেলা মরা মিয়া শুনতে পেল বাইরে একজন খোযাড়ের রক্ষক আরেক জনকে উদ্দেশ্য করে বলছে–

– যা খেল দেখালেন স্যার। কন্ট্রোল রুমে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে নিজে মারলেন মজা আর ফাঁসল হাবা গোবা গো–বেচারা। আপনার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।

কথা শুনে মরা মিয়ার ইচ্ছে হল- ওই দুইটাকে খুন করে বেয়াল্লিশ বছর খোয়াড়ে বন্দি থাকতে। কিন্তু সে যে শৃংখলার রশিতে বন্দি। তাই একরাশ থু থু ওদের দিকে নিক্ষেপ করে বলতে লাগল–

– আল্লাহ্ , আল্লাহ্ গো , ওগো হাতে জানি আর কোন তানিয়ার ইজ্জত না যায়। তানিয়াগো তুমি রক্ষা কর খোদা। আর যেই ব্যাডা আমাকে বিনা অপরাধে ফাঁসিয়েছে, হ্যারে তুমি ধ্বংস কইর‍্যা দাও। ছোট্ট এই শিশুদের এই নরপিশাচদের কু-দৃষ্টি থেকে তুমি তাদের রক্ষা কর।

খন্দকার মোঃ আবদুল গনি, নিতাই নগর, বড়ইগ্রাম, নাটোর

লেখাটি কম্পোজ করেছেনঃ সিরাজুল ইসলাম, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম